BANGLADESH JOURNAL OF ISLAMIC THOUGHT, 13(20), 2017: 113-123
Copyright © BIIT
ISSN 1816-689X

Translation Note

ভূগোল বিজ্ঞানে মুসলিম অবদান, মূল: কাজী শাকিল আহমেদ, ভাষান্তর: মো. রফিকুল ইসলাম, সহযোগী অধ্যাপক, জেনারেল এডুকেশন (বিভাগ), বাংলাদেশ ইসলামী ইউনিভার্সিটি। ই-মেইল: *rafiqulbiu@gmail.com*

মধ্যযুগে মুসলমানরাই ভূগোল বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও বিকাশ সাধনে যে অমূল্য অবদান সৃষ্টি করেন আজ এক প্রতিষ্ঠিত সত্য বলেই বিবেচিত। বিশ্বের অতীত ইতিহাসের দিকে একটু দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেই মুসলিম অবদানের তীব্রতা উপলব্ধি করা যায়। তারা শুধু নামকা ওয়াস্তে বা উদারহস্তে কিছু একটা অবদান সৃষ্টি করলেন এমনটি নয়- বরং কার্যত: তারা বিষয়টিকে পুনর্জ্জীবিত করে প্রজ্জ্বলিত করেছেন এর মৌলনীতির আলোক বর্তিকা যা পরবর্তী খ্রিষ্টান সভ্যতার করাল গ্রাসে হারিয়ে যায়।

প্রাচীন যুগে ভূগোলে অবদান সৃষ্টিকারীদের অন্যতম বিখ্যাত গ্রীক বিজ্ঞানী টলেমি। সে সময়ে এসব ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে পথ রচনার মৌলনীতির যে সব দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগ শুরু হয়েছিল- দুঃখের বিষয় তার মৃত্যুর সাথে সাথেই সেগুলোর সব প্রায় নিঃশেষ হয়ে যায়। তখন থেকেই ল্যাটিন ও গ্রীক গ্রন্থে অধিক কোনো তথ্য সংযোজন থেকে বিরত থাকা হয়।

বিশেষত জীবনের প্রতি মধ্যযুগীয় খ্রিষ্টানদের ধর্মীয় দর্শনের অধঃপতনশীল, পরাজিত ও সর্বনাশা প্রবণতা, জ্ঞান-গবেষণার প্রতি মানুষের তীব্র ঝোঁক ও উদ্দীপনা ও অনুসন্ধিৎসার আগ্রহকে সর্বতোভাবে প্রত্যাখ্যান করে। এর ফলশ্রুতিতে পার্থিব উন্নয়নের যেকোনো প্রয়াসই অনর্থ বলে বিবেচিত হতো, সেন্ট এ্যাম্ব্রোজের (St Ambrose) কথা থেকে এ ভাবধারা আরো সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। তার মতে, পৃথিবীর প্রকৃতি ও অবস্থান ভাবী জীবনের প্রত্যাশার ক্ষেত্রে আদৌ সহায়ক হবে না। এভাবেই পরবর্তী জনগোষ্ঠী সে যুগটিকে অন্ধকার যুগ বলে আখ্যায়িত করতে বাধ্য হয়েছিল।

এ প্রতিকূল পটভূমিকায় এ কথা কারোই বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে ৯ম শতক থেকে ১৪শ শতক পর্যন্ত দীর্ঘ সময় ভূগোল বিজ্ঞানে মুসলমানদের অপরিমেয় জ্ঞান গবেষণা মোটেই নামকা ওয়াস্তের ছিল না বরং তা ছিল ভৌগোলিক জ্ঞান-গবেষণার প্রকৃত পুনর্জীবনদান। জ্ঞানান্বষণের প্রতি প্রাথমিক যুগের খ্রিষ্টানদের দুঃখজনক মানসিকতার হেতু ভূগোল বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে বিশাল শুন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল তা পূরনের প্রাথমিক ধাক্কা মুসলমানদেরই সামলাতে হয়েছিল। বিশ্ব ইতিহাসের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এ পরম সত্যকে অস্বীকার করতে পারে কে? আর তাই যদি হয়ে থাকে তবে, এ সত্যটিকেও কে অস্বীকার করবে যে আধুনিক ভূগোল যেরূপে আজ অস্তিত্ববান, ভূগোলে মুসলমানদের অবদান ব্যতিরেকে কখনো তা দিনের আলোর মুখ দেখতে পেত না। সংক্ষেপে বলতে গেলে, ভূগোলে মুসলমানদের অবদান বিষয়টিকে জ্ঞান জগতের এক গুরুত্বপূর্ণ শাখা হিসেবে অধিকতর উন্নয়নের পথ উম্মোচন করে। এ বিষয়ে জি, এইচ ক্রেমার্স (H Kramers) লিখেছেন: এর (ইউরোপ) উচিত ভৌগোলিক জ্ঞান এবং বিশ্ব বাণিজ্য আবিষ্কারের ক্ষেত্রে তাদেরকে (মুসলমানদের) সাংস্কৃতিক

পূর্বপুরুষরূপে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা (It (Europe) ought to look upon them (Muslims) as its cultural ancestors in the domain of geographical knowledge and discovery of world trade).

ভূগোলে মুসলমানদের অবদান: উদ্দীপনার উৎস হিসেবে ইসলাম

ভূগোলে মুসলমানদের অবদান সম্পর্কে অপর একটি প্রশ্ন ওঠে যে, এক্ষেত্রে আরবদের পথিকৃত হওয়ার পেছনে কোন সব মৌলিক উপাদান তাঁদের উদ্দীপনার উৎসরূপে কাজ করেছে? এ পর্যায়ে এমন কি আধুনিক মুসলিম লেখকও তা অনুসন্ধান করে চিহ্নিত করতে ব্যর্থ হয়েছেন। তারা জীবন সম্পর্কে খ্রিষ্টানদের প্রাথমিক যুগের ধ্বংশাত্মক ধারণাকেই শুধু ভূগোল বিজ্ঞানের উন্নয়ন ও বিকাশের অন্তরায় হিসেবে দায়ী করে থাকেন। আর অপরদিকে ভূগোলে মুসলমানদের অভাবনীয় অবদান সৃষ্টির মূলে কেবল আরবদের নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডগত অবস্থান বা তার ব্যতিক্রমধর্মী পরিবেশকেই চিহ্নিত করেছেন। তাদের মতে শুধু এ কারণেই মুসলমানরা ভূগোলে অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু না তাদের এ যুক্তিকে বরং দ্বিতীয় স্তরের বলে বিবেচিত করা যেতে পারে এবং তা কখনো প্রাথমিক ও মৌলিক যুক্তি নয়।

সে উৎসাহ উদ্দীপনা অর্জনের উৎস তো ছিল বরং কুরআনের কতিপয় আয়াত এবং মহানবি হযরত মুহাম্মদ সা.-এর পবিত্র বাণী উপমা হিসেবে। এখানে যার কিছু মাত্র বিবৃতি তুলে ধরা হলো:

> লক্ষ্য কর, যাদের সুস্থ্য বিবেক বুদ্ধি রয়েছে, নিঃসন্দেহে তাদের জন্য আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, রাত্র দিনের আবর্তনে মানুষের জন্য উপকারী দ্রব্যাদি নিয়ে নদী ও সমুদ্রে ভাষমান চলমান জাহাজ, উপর থেকে বৃষ্টি ধারাও তার সাহায্যে পৃথিবীতে সকল প্রানশীল সৃষ্টির বিস্তার সাধনে, বায়ু প্রবাহে আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থলে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালায় অসংখ্য নিদর্শন বিদ্যমান (সূরা বাকারা, ২: ১৬৪)।

এ আয়াতসহ আরো এমন বহু আয়াত মুসলমানদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়ন, চিন্তা, অনুসন্ধিৎসা ও জ্ঞান গবেষণার জন্য অপরিহার্য নিদর্শনস্বরূপ। আল-কুরআনের অন্যত্র থেকে এমন আর একটি বিবৃতি এখানে উল্লেখযোগ্য:

> তারা কি উটগুলোকে দেখে না, কিভাবে এদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে? আকাশ মণ্ডল দেখে না, কিভাবে একে সুউচ্চে স্থাপন করা হয়েছে? পর্বতমালা দেখে না, কিভাবে সেগুলোকে মজবুত করে দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়েছে। পৃথিবীকে দেখে না, কিভাবে একে বিস্তার করে দেয়া হয়েছে (সূরা গাশিয়া, ৮৮: ১৭-২০)?

কুরআনের এ জাতীয় লোভনীয় ও প্রাঞ্জল বক্তব্য বস্তুতঃই মানুষকে আহ্বান করছে মানব জাতির কল্যাণে আল্লাহর দুনিয়া নিয়ে চিন্তা গবেষণা ও সুক্ষ্ম পরীক্ষা নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে অভিযানে বের হয়ে আসতে। কারণ পৃথিবীতে মানুষ তে আল্লাহর খলিফা বা প্রতিনিধি।

মহানবি সা. তাঁর সাহাবাদের এ বলে নির্দেশ দেন "জ্ঞান অর্জন কর, এমনকি চীনে যেয়ে হলেও"। এ কথা স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, যে জাতির সৃষ্টির উদ্দেশ্যই গোটা দুনিয়া শাসন করা, তার নিকট অতি দূরত্ব বা প্রাকৃতিক বাঁধা-বিপত্তি কোনো প্রতিবন্ধক হতে পারে না। বস্তুত: আল্লাহর বিশাল দুনিয়াকে জানার তীব্র আকাঙ্ক্ষা মুসলমানদেরকে প্রাকৃতিক কোনো বাঁধাই রুখতে পারেনি।

বিখ্যাত বিজ্ঞানী ও ভূগোলবিদ আল মাসউদী একবার উদ্ধৃতি পেশ করে বলেন, ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর রা. তার কতিপয় সেনানায়ককে উদ্দেশ্য করে এ হুকুম জারি করে পাঠান; আমার জন্য পৃথিবীর বিভিন্নস্থানের ভূমিরূপ, প্রাকৃতিক আবহাওয়া, সেগুলোর নির্দিষ্ট অবস্থান এবং অধিবাসীদের ওপর সে সবের প্রভাব কেমন কি তা এনে হাজির কর।

হযরত ওমর রা.-এর এ আদেশ এমন একটি নির্দিষ্ট জ্ঞান শাখা সম্পর্কে যথাযথ ধারণা দান করে যা পরবর্তীতে ভূগোল নামে পরিচিত হয়। এ থেকে প্রমাণ মেলে যে, একেবারে শুরু থেকেই মুসলমানরা ভৌগলিক জ্ঞানের পরিপূর্ণ তাৎপর্য উপলব্ধি করেছিলেন।

সংক্ষেপে তাই এ চেতনাই আরব অভিযাত্রীদেরকে দূর-দূরান্তের পথ পাড়ি দিয়ে, সুদূর দেশ দেশান্তরে অভিযান চালিয়ে সে সবের ভূমিরূপ, জনগণ তথা ভূগোলের বিষয়াদি জানতে উদ্দীপ্ত করে তোলে।

হজের পবিত্র প্রতিষ্ঠান তেমনি দুনিয়ার মুসলমানদের মধ্যে শুধু সৌভ্রাতৃত্বের সম্পর্কই সমৃদ্ধ করে না বরং বছরে অন্তত একবার নিজেদের মধ্যে মত বিনিময়ের সুযোগ এনে দেয়। এভাবে মক্কা মু'আজ্জামার বার্ষিক সম্মেলন শুধু যে বিভিন্ন দেশ ও তাদের জনগণ সম্পর্কে তথ্য দান করে তা-ই নয়, বরং একই সাথে তা মুসলিম হৃদয়বৃত্তিতে দুঃসাহসিকতা ও দেশ ভ্রমণের উদগ্র বাসনা জাগিয়ে তোলে এবং নিজেদের ভাইদের সাক্ষাত প্রাপ্তির মানসে তারা পরম দূরত্বকেও এতটুকু পরওয়া করেননি। ফলে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই বেশ কিছু দুঃসাহসিক ব্যক্তিত্ব নিজ নিজ মাতৃভূমি থেকে বের হয়ে এসে দীর্ঘ বন্ধুর পথ অতিক্রমের গুরু দায়িত্বভার কাঁধে তুলে নেন এবং ভ্রমণকৃত স্থানগুলোর অভিজ্ঞতার বর্ণনা উপস্থাপন করেন। ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে এ সমস্ত ভ্রমণপঞ্জী সৃষ্টি পরবর্তী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশ বিজয়ে মুসলিমদের সহায়ক হয়েছে।

গোটা বিষয়টিকে সহজে উপলব্ধির জন্য ভূগোল বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদানকে আমরা মূলত ৪টি ভাগে বিন্যস্ত করে আলোচনায় অগ্রসর হতে পারি।

১. বিখ্যাত মুসলিম ভূগোলবিদ ও তাদের কর্ম।
২. মানচিত্র ও মানচিত্রাঙ্কন।
৩. জ্যোতির্বিদ্যা ও গণিতশাস্ত্র সংক্রান্ত ভূগোল।
৪. ভ্রমণ সাহিত্য।

মুসলিম ভূগোলবিদ ও তাদের কর্ম (Important Muslim Geographers and their Works)

আব্বাসীয় যুগে বিশেষ করে হারুন আর রশীদের (৭৬০-৮০৯) সময়ে পর্যবেক্ষণমূলক ও প্রায়োগিক বিজ্ঞান (Empirical Science)-এর অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধিত হয়। এর দৃষ্টান্ত হলো গ্রীক থেকে আরবি ভাষায় ব্যাপক অনুবাদ। মুসলমানরা প্রথমেই টলেমির রচনা, 'দি আলমাজেস্ট' এর সূচি নিয়ে চিন্তা ভাবনা করেন। বিজ্ঞানভিত্তিক এ বিখ্যাত রচনাটি ইবনে খুরদাবাঈ, আল কিন্দি ও সাবিত ইবনে কুররাহ- এ বিখ্যাত তিন পণ্ডিতদ্বয় কর্তৃক আরবিতে অনুদিত হয়।

আল খাওয়ারিজমী

ভূগোল বিজ্ঞানে মুসলিম অবদানের ভিত রচনা করেন মুহাম্মদ বিন মূসা আল খাওয়ারিজমী। শিক্ষার মহান পৃষ্ঠপোষক আব্বাসীয় খলিফা আল মামুনের সময়ে বাগদাদেই তিনি জন্ম গ্রহণ করেন ও শিক্ষা-দীক্ষা অর্জন

করেন। তার গ্রন্থ *'কিতাব আলছুরাত আল আরদ'- পৃথিবীর আকার*, নবম শতকের প্রথমার্ধে রচিত হয়। A. C. Nellino এটিকে ইটালি ভাষায় অনুবাদ করেন। গ্রন্থটি সম্পর্কে তার মন্তব্য বিজ্ঞানের ঊষালগ্নে এমন গ্রন্থ কোনো জাতি উপহার দিতে সক্ষম হয়নি।

নবম শতকে বিখ্যাত উদ্যোগী ভূগোলবিদদের মাধ্যমে কতিপয় দেশের ভূগোল সংক্রান্ত লেখার একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এদের মধ্যে খাওয়ারিজমী ব্যতীত আরো যারা বিখ্যাত তন্মধ্যেইবনে খুরদাবাঈ, আল ইয়াকুবী, ইবনে আল ফকীহ এবং ইবনে রুসতা প্রমূখই সর্বপ্রধান।

ইবনে খুরদাবঈ (আবুল কাসিম উবাইদুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ) রচনা করেন বিখ্যাত গ্রন্থ: *কিতাব আল মাসালিক ওয়াল মামালিক* অর্থাৎ *রাজপথ ও রাজ্যসমূহ*। এক্ষেত্রে এ গ্রন্থটিই অন্যন্য হিসেবে মশহুর।

প্রাথমিকভাবে এটি আরব বিশ্বের ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রধান গমনাগমন পথ নির্দেশনা নিয়ে আলোচনা করে। সেই সাথে এতে চীন, কোরিয়া ও জাপানের দূরত্ব সীমাও আলোচিত হয়েছে। পরবর্তীকালে গ্রন্থটি তথ্যের বিশাল উৎস ভাণ্ডার হিসেবেই কাজে এসেছে।

আল ইয়াকুবী

খুব যশ ও খ্যাতিবান ভূগোলবিদ আল ইয়াকুবী। তিনি মিসর অধিবাসী আব্বাসীয় খলিফা পরিবারের সন্তান। তিনি ছিলেন বিখ্যাত পর্যটক। ভারতের পূর্ব থেকে পশ্চিমের উত্তর পশ্চিম আফ্রিকার বেশ কিছু দেশ তিনি ভ্রমণ করেন। তার বিখ্যাত গ্রন্থ *কিতাব আল বলদান 'দেশসমূহের গ্রন্থ' বর্ণনামূলক* গ্রন্থটি প্রাকৃতিক ও মানবীয় ভৌগোলিক তথ্যে সমৃদ্ধ। বাগদান, সামারান, ইরান, তুরান এবং বর্তমান আফগানিস্তান সম্পর্কে রয়েছে এতে বিশদ বর্ণনা। তাছাড়াও এতে পাওয়া যায় কুফা, বসরাসহ মধ্য এবং দক্ষিণ আরব, সিরিয়া, মিসর ও পাশ্চাত্য দেশসমূহের সুবিস্তৃত বিবরণ।

ইবনে আল ফকীহর প্রধান গ্রন্থ ইরানের বিখ্যাত হামাদান শহরের আবাসিক এলাকা সম্পর্কিত। তার গ্রন্থটির নাম ও *'কিতাব আল বুলদান'* বা *দেশসমূহের গ্রন্থ'*।

ইবনে রুসতা

তিনি ভূগোল বিজ্ঞান সম্পর্কিত একটি বিশ্বকোষের সম্পাদনা করেন (বৃটিশ জাদুঘরে এখনও তা সুরক্ষিত)। তাঁর এ বিশ্বকোষ ভূগোল সম্পর্কিত। তিনি এতে পৃথিবীর পরিসীমা নদ, নদী, সমুদ্র, আবহাওয়া, ইরানের ভূগোল ও ইরানের পাশ্ববর্তী দেশসমূহের বর্ণনা সুস্পষ্টভাবে চিত্রিত করেন। তাঁর বর্ণিত মহা খোরাসান সড়ক থেকে সুদূর তাস (বর্তমানে যা মাশেদ), ভূগোলবিদদের নিকট মজার খোরাক হয়ে আছে। এভাবে আমরা দেখতে পাই নবম শতকের ভূগোল বিজ্ঞানের রচনাগুলো প্রথম আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের সাথে সংযুক্ত বিভিন্ন প্রদেশের গমনাগমন ও রাজপথ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে রচিত।

যুগের দশম শতকে ভূগোল বিজ্ঞানের এমনি সফলতা যে অস্তিত্ব লাভ করে তা, 'দি জিওগ্রাফিক্যাল স্কুল অব ইসলাম, অর্থাৎ 'ইসলামের ভূগোল প্রতিষ্ঠান' নামে সুপরিচিত। এ প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট লেখক ও রচয়িতাদের সবাই ছিলেন বাস্তবে শ্রেষ্ঠ পর্যটক।

আল-বাল্‌খী

তাঁর অপর নাম আবু যায়দ আহমদ বিন সাহ্‌ল। তিনি প্রথম যুগের মুসলিম ভৌগলিক ম্যাপ বা মানচিত্র নির্মাতাদের অন্যতম। চার্টের ব্যাখ্যা ও এর নির্দেশনাপূর্ণ তার লেখার বিরাট অংশ, *কিতাব আল আশখাল* অথবা *ছুরাত আল আগালিম* এ প্রকাশিত হয়েছে। এ সবই তার ভৌগলিক চিত্র সম্বলিত রচনা।

ইবনে হাওকাল

আবুল কাসিম ইবনে হাওকাল দশম শতকের বিখ্যাত পর্যটক ঈসায়ী ৯৪৩ সালে বাগদাদ থেকে যাত্রা শুরু করে সুদীর্ঘ ত্রিশ বছর ধরে তিনি গোটা মুসলিম জাহান ভ্রমণ করেন। অতঃপর তিনি তাঁর বিখ্যাত ভূগোল বিজ্ঞান রচনা সুসম্পন্ন করেন।

আল মাসউদী

দশম শতকের বহুমূখী প্রতিভাধর গ্রন্থ রচয়িতাদের তিনি অন্যতম ও তার সম্পর্কে সি ব্রকলম্যান (C. Brockelman) মন্তব্য করে বলেন, তিনি যখন একান্তই কিশোর, তখনি তিনি পারস্য অতিক্রম করে (হি. ৩০৫ খ্রি. ৯১৫)। এ বছরেরই একটি বড় অংশ তিনি ইসতিখারে কাটান।

স্প্রেঞ্জার (Sprenger) তাকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ভূগোল বিজ্ঞানী (Greatest geographer of all ages) বলে আখ্যা দেন। তাছাড়া তাঁর ছিল বিরল বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি যা ১৯ শতকের ভূগোলবিদদের মধ্যে পর্যন্ত দৃষ্টিগোচর হয়নি। আল মাকাদিসী ছিলেন বিখ্যাত পর্যটক, যিনি শুধু ভারত ও স্পেন ছাড়া গোটা মুসলিমবিশ্ব পরিভ্রমণ করেন। তিনি রচনা করেন *"আহসান আল তাকাসিম ফী মারিফাত আল আকালিম"- "ভূ-খণ্ড পঞ্জী ও আবহাওয়ার সর্বোৎকৃষ্ট জ্ঞানবিভাগ"*।

এটি সত্যিই বিস্ময়কর যে, তাঁর অর্জিত দশম শতকের ভূগোলের ধারণা আধুনিক বিশ্বের ভূগোল সংক্রান্ত ধারণার নিকটবর্তী। তিনি বলেন, আমি ভেবে দেখেছি বিষয়টি বরং পর্যটক ও ধনাঢ্য ব্যবসায়ীদের নিকট আপাত: গুরুত্বহীন বিবেচিত হতে পারে। এটি বরং রাজপুত্র, মহান ব্যক্তিত্ব, বিচারক এবং আইনজ্ঞদের নিকট গুরুত্ব বহ। আর সর্ব সাধারণ, জনমানুষ এবং মর্যাদাবান ব্যক্তিত্বদের নিকট প্রতিপন্ন হবে এক আনন্দের খোরাকরূপে।

ইবনে ফাদলান

আহমদ ইবনে ফাদলান আব্বাসীয় খলিফা আল মুকতাদির কর্তৃক বুলগেরিয়ায় রাষ্টদূতরূপে প্রেরিত হন (৯১২ খ্রি.)। ভলগায় অবস্থানকালে তিনি তাঁর গবেষণা ধর্মী *'রিসালাহ্‌ রচনা করেন'*। এতে স্থান পেয়েছে রাশিয়ার প্রাথমিক যুগের তথ্যাবলীর নির্ভরযোগ্য বর্ণনা।

আল বিরুনী

তাঁর অপর নাম আবু রাইহান মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ, যিনি সর্বযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী হিসেবে খ্যাত। একাধারে তিনি ছিলেন বিজ্ঞানী, ঐতিহাসিক, প্রকৃতিবিদ, প্রাণীবিজ্ঞানী, জ্যোতির্বিজ্ঞানী, গণিতশাস্ত্র বিশারদ এবং

বিশাল পণ্ডিত এবং বিভিন্ন বিষয়ের পর্যবেক্ষক, বিশেষত জ্যোতির্বিজ্ঞান, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এবং আঞ্চলিক ভূগোল বিজ্ঞানে তার অবদান বিশাল এবং অমূল্য।

বেশ কয়েক বছর ভারতে ভ্রমণ করে যাবতীয় তথ্যাদি সংগ্রহের পর রচনা করেন তাঁর বিখ্যাত *'কিতাব আল হিন্দ'*। আঞ্চলিক ভূগোল বিজ্ঞানে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান হিসেবে এটি স্বীকৃত।

তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ ভূগোলবিদ যিনি ইন্দো-গাঙ্গেও সমভূমি (Indo Gangetic Plain) এর উৎসের নির্দেশনা দান করেন- যা প্রকৃতি বিজ্ঞানের বিবর্তনের ক্ষেত্রে আর একধাপ অগ্রগতি। তিনি ভারতের ভূগোল সম্পর্কে অভাবনীয় ও বিস্তারিত বর্ণনা পেশ করেন। তার বর্ণনায় ফুটে ওঠে দেশের সীমান্ত অঞ্চল, ভূ-প্রকৃতি, বৃষ্টিপাতের ধরন, কনৌজ থেকে সার্বিক নির্দেশনাসহ প্রধান প্রধান জনপদ, বিভিন্ন শহর বন্দরের ব্যবসা ও বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড, বেলাভূমি ও দেশের সে সব স্থানের বৃক্ষলতা ও পশু পাখির জীবন প্রবাহ।

আল ইদ্রিসী

১১ শতকের সবচেয়ে নামকরা ভূগোল বিজ্ঞানী আল ইদ্রিসী *নুজহাতুল মুশতাক* গ্রন্থের রচয়িতা। গোটা ইসলামি দুনিয়া ও ইউরোপ দীর্ঘ ভ্রমণের পর রাজা রজার (King Roger) কর্তৃক ইতালীর প্যালারমো কোর্টে (The Court of Palarmo) নিযুক্ত হয়ে সেখানে তিনি স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।

ক্রেমার্স (Kramers)-এর মতে বাস্তব ঘটনা যা নিম্নরূপ: রাজা রজার বিশ্বস্ত ভেবেই মুহাম্মদ সা.-এর এ অনুসারীর ওপর পরিচিত বিশ্বের বর্ণনা তুলে ধরার দায়িত্বভার অর্পন করেন। এ থেকে স্পষ্টই বুঝতে পারা যায় সে যুগে মুসলিম উম্মার জ্ঞানের পরিধি ও উৎকর্ষতা ছিল কতই না ব্যাপক।

ইয়াকুত আল হামাভী

বিখ্যাত ভৌগোলিক অভিধান *মুযাম আল বুলদান* এর গ্রন্থকার তিনি। ৬ খণ্ডে বিভক্ত এ অভিধান লেইপ জিং এ ১৬৬৬-১৬৭৩ এর মধ্যে সম্পাদিত হয়ে প্রকাশ পায়। এতে ভৌগোলিক বিষয় সম্পর্কিত যাবতীয় নাম, বর্ণ বা অক্ষর ভিত্তিক ক্রমানুসারে আলোচিত হয়েছে। তাছাড়া এ গ্রন্থে রয়েছে পশ্চিমে স্পেন থেকে পূর্বে ভারত পর্যন্ত মুসলিম অধ্যুষিত ভূ-খণ্ডের পূর্ণ বিবরণ। সম্ভবত তিনিই প্রথম ভূগোলবিদ যিনি ভূগোল বিজ্ঞানে সমালোচনামূলক পদ্ধতি প্রয়োগ করেন, যা আধুনিক ভূগোল বিজ্ঞানের এক প্রধান বৈশিষ্ট্য বিশেষ।

আল কাযবিনী

তাঁর অপর নাম যাকারিয়া বিন মুহাম্মদ (১২০৩-১২৮৩)। তিনি *আজাইব আল মাখলুকাত ওয়াল গারাইব আল মাউজুদাত* নামক এক গবেষণাধর্মী ভূগোল বিজ্ঞানের রচয়িতা। মুসলিম সাহিত্যে এ গ্রন্থটিই সৃষ্টি রহস্য সংক্রান্ত বিষয়ের ওপর প্রথম গঠনমূলক গ্রন্থ। তার অপর একটি ভৌগোলিক সৃষ্টিকর্ম হল *আছার আল বালাইন্দ ওয়া আখবাল ইবাদ*।

হামিদুল্লাহ্ মুসতাভী

তাঁর *নুযহাতুল কুতুব* খুবই গুরুত্ব ও তাৎপর্যের দাবিদার। গবেষণামূলক এ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে ভূগোল শাস্ত্রের নানা বিষয়, মুসলিম বিশ্বের সকল অংশের ভূ-প্রকৃতি এবং সে সব স্থানের মানব সম্পদ ও বিশেষ করে ইরান এবং মধ্য এশিয়ার সুবিস্তৃত বর্ণনা।

ইবনে বতুতা

সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে বতুতা। তিনিই মধ্যযুগের সেরা পর্যটক। ইউল (Yule) এর মতে তার সুদীর্ঘ ভ্রমণের পরিমাণ অন্তত: ৭৫,০০০ মাইলের কম নয়। বাষ্পীয় শক্তি আবিষ্কারের পূর্বে সম্ভবত তাঁর এ সমপরিমাণ দূরত্ব কেউ অতিক্রম করতে পারেননি (Gibb, Ibn Batuta p. 9)। বিভিন্ন স্থান ভ্রমণের পর তিনি যে বর্ণনা তুলে ধরেন তাতে রয়েছে সে সমস্ত স্থানের প্রাকৃতিক পরিবেশ, দূরবর্তী ভূ-ভাগের শহর, বন্দর ও সমুদ্র পথের মূল্যবান তথ্যাবলী।

কনস্টান্টিনোপল থেকে দক্ষিণ ইউক্রেন হয়ে ফেরার পথের প্রকট শীতের কথা সম্পর্কে তিনি বলেন- শীতের প্রকোপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাকে তিনটি পশমী কোট ও দুইজোড়া পাজামা পরতে হয়েছিল। এমন কি যখন তিনি আগুনের পাশে থেকেই অযু করছিলেন, তখন তার দাঁড়ি বেয়ে পানি পড়ার সাথে সাথে তা বরফ হয়ে যাচ্ছিল। চীন ভ্রমণের কাহিনীতে তিনি কয়লার ব্যবহারের উল্লেখ করে বলেন, তারা কাঠ কয়লার মতো করে পাথর দিয়ে আগুন ধরাতো। যখন তা জ্বলে ছাই হতো, তা পানির সাথে মিশিয়ে সূর্য তাপে শুকিয়ে পুনরায় রান্নার কাজে ব্যবহার করতো। অর্থাৎ যতক্ষণ না তার উপযোগিতা নিঃশেষ না হতো এভাবেই তার ব্যবহার চলত।

ইবন বতুতার সমুদ্র ভ্রমণ ও তার নৌ চলাচল নির্দেশিকা মুসলমানদেরকে সম্পূর্ণরূপে লোহিত সাগর, আরব সাগর, ভারত সাগর ও চীন সমুদ্র সীমার প্রভাব প্রতিষ্ঠার সুযোগ এনে দেয়।

মানচিত্রাঙ্কন (Cartography)

কার্টোগ্রাফী চিত্রাঙ্কন বা মানচিত্রাঙ্কন হচ্ছে মানচিত্র যা ভূগোলের আবশ্যিক শাখারূপে বিবেচিত। যদিও এ কথা সত্যি যে ভূগোলের এ শাখায় মুসলিম ভূগোলবিদদের অবদান তত তীব্র নয় তবুও এ কথা অস্বীকার করার জো নেই যে, আরব ভূগোলবিদরা মানচিত্রের মাধ্যমে পৃথিবীর গতি যে সঠিক নির্দেশ করেন- তৎকালে ইউরোপে প্রচারিত ধারণার চেয়ে তা ছিল অধিকতর সঠিক ও বাস্তব।

শুধু তাই নয়, এক্ষেত্রে প্রাচীন কর্মের ওপর মুসলিম ভূগোলবিদগণ ভিন্ন বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত অগ্রগতি সাধন করে আকাশ সম্বন্ধীয় গ্লোব তৈরি করে এ ক্ষেত্রের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে গবেষণা চালান। মুসলিম শাসনাধীনের অঞ্চলগুলোর মানচিত্রসমূহ ছিল টলেমির রচিত মানচিত্রের চেয়ে উৎকৃষ্ট। আর একটি উন্নত প্রবণতার পরিচয় মেলে তা হলো- এ যুগে স্কুল ও বিদ্যাপীঠসমূহে ভূগোল বিদ্যার ক্ষেত্রে মানচিত্র ব্যবহৃত হতো নিয়মিত।

ভূগোলক তৈরির অন্যতম পথিকৃত আলখাওয়ারিজমী। তার কিতাব *আল ছুরাত* অর্থাৎ *পৃথিবীর আকাশ* মানচিত্রের ব্যাখ্যা সম্বলিত একটি গ্রন্থ। খলিফা আল মামুনের সৌজন্যে প্রস্তুতকৃত বিখ্যাত মানচিত্রের ৭০ জন সু-পণ্ডিতের অন্যতম তিনি। পরবর্তীতে আমরা বালখির আটলাসে একটি বিশ্বমানচিত্র, আরবের মানচিত্র, ভারত মহাসাগর, মাগরিবের মানচিত্র (মরক্কো, আলজেরিয়া ইত্যাদি), মিশর, সিরিয়া, ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চর এবং সেন্ট্রাল ও ইস্টার্ণ মুসলিম বিশ্বের প্রায় ডজন খানেক মানচিত্র দেখতে পাই। কে মিলার (K Miller) তার '*Mappae Arabica*' এটিকে ইসলামিক এ্যাটলাস বলে উল্লেখ করেন।

মকদিসী তার গ্রন্থের একস্থানে চিত্রাঙ্কন সম্পর্কে যে বাস্তব চিত্র তুলে ধরেন তা নিম্নরূপ:

এ মানচিত্রগুলোতে সুপরিচিত গমনাগমন পথকে লাল রং দ্বারা চিত্রিত করা হয়েছে। সোনালী মরুভূমিকে হলুদ, লোনা সমুদ্রগুলোকে সবুজ ও সুপরিচিত নদ-নদীগুলোকে চিহ্নিত করা হয়েছে নীল রং এবং প্রধান প্রধান পাহাড়গুলোকে ধূসর বর্ণ দিয়ে। আল বিরুনী তার কিতাব *আল তাফহীম* এ পৃথিবীর গোলাকার চিত্রাঙ্কন করে সমুদ্রগুলোর অবস্থান নির্ণয় করেন।

তিনি আকাশ ও পৃথিবীর মানচিত্র সম্পর্কিত বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন।

আল ইদ্রিসী মধ্যযুগের বিখ্যাত মানচিত্র নির্মাতা। বলা হয়ে থাকে যে, তিনি তার আবহাওয়ার উপর প্রায় ১০টি ম্যাপ তৈরি করেন। তন্মধ্যে একটি ছিল মহাকাশ মম্বন্ধীয় রূপার তৈরি গ্লোব।

জ্যোতির্বিদ্যা ও গণিতশাস্ত্রীয় ভূগোল (Astronomical and Mathematical Geogpraphy)

এর মানে এ নয় যে জ্যোতির্বিদ্যা ও গণিতশাস্ত্রীয় সম্বন্ধীয় বিজ্ঞানে মুসলিম অবদানের বিস্তৃত চিত্র এখানে তুলে ধরা হচ্ছে। বরং এখানে শুধুমাত্র কতিপয় মুসলিম মনিষার কিছু অর্জন বা মহৎকর্মের প্রধানতর চিত্র তুলে ধরাকেই যথেষ্ট মনে করা হচ্ছে। আল বিরুনী, আবু আলী সিনা, ইবনে মজিদ প্রমূখ তাদের প্রধান।

আল বিরুনী

পবিত্র আল কা'বার সাথে অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমার দূরত্ব ও সমন্বয় সাধন পরিমাপ ও যাচাইয়ের মত বিষয়ে আল বিরুনী যে সমস্ত গ্রন্থ রচনা করেন অবশ্যই তার সংখ্যা অন্তত পনেরটি। এছাড়াও আরো পাঁচটি পুস্তিকায় তিনি ভূগোল বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি ও তার ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি স্ট্যারিওগ্রাফিক (Stereographic) প্রজেকশনের সহজ পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। সেই সাথে তিনি স্থিতিশক্তি সংক্রান্ত নিয়মে প্রাকৃতিকভাবে পানির ফোয়ারাও কৃত্রিম ঝর্ণা সৃষ্টির কারণ ব্যাখ্যা করেন। তিনি অবশ্য পৃথিবীর অক্ষ রেখা ও তার গতিবিধি আলোচনা করেন।

আবু 'আলী সীনা

পাশ্চাত্যে তিনি আভিসিনা (Avecenne) নামে সুপরিচিত। তিনি আল বিরুনীর সমসাময়িক পদার্থ ও জ্যোতির্বিদ্যার এক শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত যন্ত্রপাতির ওপর তার গবেষণামূলক লেখা *'বিশ্বে পৃথিবীর অবস্থান'* তারকারাজি, নক্ষত্র তথা জ্যোতিস্কমণ্ডলী ও এসব ক্ষেত্রে তার যন্ত্রপাতির সফল ব্যবহারসহ জ্যোতির্বিদ্যামূলক ভূগোল বিজ্ঞানে তার অবদান সত্যিই উজ্জল।

আবু 'আলী-আল হাসান

আবু 'আলী-আল হাসান জ্যোতির্বিদ্যা ও গণিতশাস্ত্র সম্পর্কীয় ভূগোল বিজ্ঞানের এক মহান পণ্ডিত। জ্যোতির্বিদ্যায় ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির এক গবেষণামূলক গ্রন্থের রচয়িতা তিনি। তার এ গবেষণামূলক রচনাকে একজন বিখ্যাত পণ্ডিত গণিত-শাস্ত্র সম্মস্কীয় ভূগোল বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সবচে' গুরুত্বপূর্ণ অবদান বলে বিশেষিত করেন। তার এ অবদান শুধু ইসলামি জগতেই নয় বরং সর্বত্রই তা এক অনন্য অবদান হিসেবে স্বীকৃত। এমনকি মধ্য যুগের

লেখকদের কেউ বিজ্ঞান ভিত্তিক পদ্ধতি ও ব্যবস্থা গ্রহণে তার মতো এতটুকু মাথা ব্যাথা ও তাগিদ অনুভব করেননি।

উপায়-উপকরণসমূহের ব্যবহার (Instruments in Use)

প্রয়োজনীয় কিছু যন্ত্রপাতি, হাতিয়ার ও উপকরণ ছাড়া পরিমাপ ও পর্যবেক্ষণ কখনো সম্ভব নয়। এ দৃষ্টিভঙ্গি উদ্ভাবনী ক্ষমতাসম্পন্ন প্রতিভাধর মুসলিম ভূগোল বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আদৌ এড়াতে পারেনি। অবশ্য এর কিছু যন্ত্রপাতি বিশেষ করে গ্রীক যুগে আবিষ্কৃত হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে প্রচুর অগ্রগতি, উন্নয়ন এবং উল্লেখযোগ্য বেশ কিছু নবতর আবিষ্কার সাধিত হয়েছে মুসলিম ভূগোলবিদদের হাতেই।

'যাত আল আওতার' বিভিন্ন অক্ষাংশে সময় নির্ধারণ করার জন্য চৌকোস সিলেন্ডার, 'যাত আস সিমত ওয়াল ইরতিফা আল মুশাব্বিহাত বিল মানাতি'- নির্দিষ্ট দূরত্বে কোনো লেখা সঠিকভাবে পড়ার যন্ত্র। তাছাড়া তাদের বিরাট আবিষ্কার হালকাত আল বুকরা ওয়াল হালকাত আল সুগরা- ছোট-বড় বিভিন্ন প্রকারের সূর্য ডায়্যাল ও দিকদর্শন যন্ত্র। তবে তাদের সে মহৎ আবিষ্কারের সামান্যই আমরা জানতে পেরেছি।

সমুদ্রের নাবিকদের কম্পাস বা দিক-দর্শন যন্ত্রের মত জরুরি উপকরণের আবিষ্কার আজো পাশ্চাত্যে এক বিতর্কিত ব্যাপার। তবে সুলাইমান নদভীর মতে কুতুব নামায় ইদ্রিসীর রচনাতেই সর্ব প্রথম এর উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁর মতে আরবদের মাঝে এর সচরাচর ব্যবহার চলতো।

পৃথিবী গোলাকার, মুসলমানদের এ তত্ত্বটিকে উপহাস করে খ্রিষ্টান জগত একে অবিশ্বাস্য বলেই উড়িয়ে দিত। অথচ আরব ভূগোল বিজ্ঞানীগণ অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে 'পৃথিবী গোলাকার, এ তত্ত্বের উপর সু-দৃঢ় অবস্থান ব্যক্ত করেন। আর এ বিষয়টি ছিল এমনি একটি গুরুত্ব ও তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় যা ছাড়া আমেরিকা আবিষ্কার ছিল অসম্ভব।

পৃথিবীর সঠিক আকার ও আয়তন নির্ণয়ে মুসলিম ভূগোলবিদগণ আত্মনিয়োগ করেন। তারা এসব সমস্যা নিরসন কল্পে বহু পূর্বের গ্রীক পণ্ডিতগণের পদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে অগ্রসর হন। এভাবে আল বাত্তানী ও আল ফারগানী পৃথিবীর ব্যাসার্ধ নির্ণয় করেন ৩২৫০ আরবীয় মাইল। ইবনে রুস্তার মতে এর ব্যাসার্ধ ৩৮১৮ মাইল। আল বিরুনীও এ সমস্যা নিয়ে অগ্রসর হয়ে যে সিদ্ধান্ত দেন তা অন্যান্য পণ্ডিতদের তুলনায় বেশ গুরুত্বের দাবিদার।

মধ্যযুগের কতিপয় ভূগোল বিজ্ঞানী পৃথিবীর পরিভ্রমণ, ঘূর্ণন বা গতি নিয়ে আলোচনা করেন। আল কাতিবি আল ক্বাযবিনী তার *হিকমাত আল আইন* গ্রন্থে পৃথিবীর পরিভ্রমণ সম্পর্কে অনুসিদ্ধান্ত দান করেন।

নৌ-বিজ্ঞান (Navigation)

কম্পাস তথা দিক নির্দেশক যন্ত্রের কারণে বিশাল ও মহাসমুদ্রগুলো ছিল মুসলমানদের জন্য উন্মুক্ত। ফলে মধ্যযুগে তারাই সমুদ্রচারী জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তখন বেশ কিছু সমুদ্রের জরিপ কাজ, সমুদ্র চিত্রাঙ্কন প্রস্তুতকরণ ও কিছু পথপঞ্জী সংকল্পনের কাজ মুসলমানদের হাতেই সুসম্পন্ন হয়। (স্থান-কাল-সম্পর্ক সাদৃশ্য প্রসঙ্গ প্রভৃতি দিক দিয়ে) দুনিয়ার বহু দূরবর্তী এলাকা এমনকি প্রত্যন্ত অঞ্চলেও পণ্য দ্রব্য পৌঁছে দেয়ার জন্য তৈরি হতো বিশাল বিশাল নৌ-যান। সিদি আল ইবনে হুসাইন 'মহাসমুদ্র বিজ্ঞান' এর উপর তিনি তাঁর বিখ্যাত '*আল মুহীত*'

গ্রন্থে সম্পূর্ণরূপে ভূগোল বিজ্ঞান ও সমুদ্র এবং সমুদ্রের পরিমাপ বা জরিপ সম্পর্কীয় বিষয়ের উপর সুস্পষ্ট বর্ণনা উপস্থাপন করেন।

মুসলিম বিশ্ব যে বহু সমুদ্র বিজ্ঞানী উপহার দান করেছে তাদের মধ্যে দুই মহান ব্যক্তিত্ব হলেন- সুলাইমান আল মাহরী এবং শিহাব উদ্দীন ইবন মাজিদ। সুলাইমান আল মাহরী- তিনি ইবন মাজিদের সমসাময়িক ও তার অনুজ। ১৬ শতকের প্রথমার্ধে নৌ-বিজ্ঞানের উপর তিনি পাঁচটি গবেষণামূলক গ্রন্থ-রচনা করেন। এগুলোর মধ্যে তৃতীয়টি আরব সাগর, পূর্ব আফ্রিকার সমুদ্র পথ, বঙ্গোপসাগর, মালয় ও ইন্দোচীন উপকূল সাগরীয় দ্বীপ ও ভারত মহাসাগরীয় মৌসুমী বায়ু সম্পর্কিত বর্ণনা। পরবর্তী জনগোষ্ঠীর নিকট আরো অধিক সুপরিচিত অর্জন করেছেন সমুদ্র বিজ্ঞানী ইবনে মাজিদ।

আল্লামা সাইয়্যিদ সুলাইমান নদভী, তিনি তার *এ্যারাবান কী জাহাজ্রেনী* গ্রন্থে নৌ-বিজ্ঞানের ওপর ইবন মাজিদের ১৫টি গবেষণা গন্থের তালিকা প্রদর্শন করেন। এ সমস্ত কিতাবের অন্যতম কিতাব *'আল ফাওয়াইদ ফী উসূলিল বাহর ওয়াল কাওয়াইদ'* পরবর্তী মধ্যযুগে নৌ-বিজ্ঞানের সিনথেসিম (Synthesis of Nautical Science) অর্থাৎ সংশ্লেষণ হিসেবে কাজে এসেছে।

জি. ইরান্ড (G Errand)-এর মতে, ইবনে মাজিদ নৌ-বিজ্ঞানের আধুনিক লেখকদের পথিকৃত। তার এ গবেষণা কর্ম সত্যিই প্রশংসা ও শ্রদ্ধার দাবিদার। দৃষ্টান্তস্বরূপ লোহিত সাগরের যে বর্ণনা তিনি পেশ করেছেন নৌ-বিজ্ঞানের কোনো লেখক তাকে অতিক্রম করা তো দূরের কথা এমনকি আজ পর্যন্ত কেউ তার সমকক্ষতাও অর্জন করতে সক্ষম হননি।

ভাস্কো-দা-গামার জীবন ইবনে মাজিদের সহযোগিতায় এক বিরাট সৌভাগ্যের দ্বারা উন্মোচন করে। তার পথ প্রদর্শনের মাধ্যমেই ভাস্কো-দা-গামা ভারতের ক্যালিকাট পর্যন্ত পৌঁছে যান।

নৌ-ব্যবস্থার এরূপ ক্রমোন্নতির ফলে ও মুসলিম পর্যটকদের অব্যাহত ভ্রমণের কারণে এক বিরাট আন্তর্জাতিক ব্যবসা বাণিজ্য ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলিম বিশ্বের এ সমস্ত বণিক ও ব্যবসায়ী গোষ্ঠী মারফত মুসলিম বিশ্বে আমদানী হত চীনের সিল্ক জাতীয় বস্ত্র, ভারত ও সুদূর প্রাচ্যের মসলা, উত্তর মেরু অঞ্চল থেকে পশম ও পশমজাত দ্রব্য, এ সবই আবার রপ্তানি হতো ইউরোপের দেশে দেশে।

আজও আধুনিক ইউরোপের বাণিজ্যিক বিষয়ে এমন সবকিছু শব্দ ও পরিভাষা প্রচলিত রয়েছে যার মূল উৎস আরবি যেমন: ট্রাফিক (Trafitic), ফেয়ার ক্যালিব্র (Fare Calibre), ক্যাবল (Cable), চেক (Cheque), কারাত (Curat), রিম (Ream), ম্যাগনেট (Magent) তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এ সমস্ত বাস্তব উদাহরণ থেকে সহজেই বুঝতে পারা যায় যে, মধ্য যুগে মুসলমানরা ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কত না অগ্রগতি সাধন করেছিলেন! উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটাও স্পষ্ট হচ্ছে যে, তখন মুসলমানরা সত্যিই ইউরোপের ব্যবসায় ও বাণিজ্যিক জীবনকে প্রভাবিত করেছিলেন।

পর্যটন বা ভ্রমণ সাহিত্য (Travel Literature)

আধুনিককালে স্কুল-কলেজসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে বিজ্ঞান অধ্যয়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মধ্যযুগে ইসলামি দুনিয়া এমন সংখ্যক উদ্যোগী পর্যটক উপহার দান করেছে যারা নিজেদের জ্ঞান-গবেষণা, অধ্যয়ণ নিরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে রচিত করেছেন ভূগোল বিজ্ঞানের বিশাল জ্ঞানভান্ডার।

এ পর্যায়ের লেখক, পর্যটকদের মধ্যে আলী মাকদিসী, ইব্রাহীম ইবনে ইয়াকুব, ইবনে যুবায়র ইবন বতুতা, ইবন যায়দ এবং আরো বহু পথিতযশা লেখকের নাম উল্লেখযোগ্য।

আল মাকদিসী ১০ম শতকে শুধু স্পেন ও সিন্ধু ছাড়া গোটা ইসলামি দুনিয়া পরিভ্রমণ করেছেন। সুদীর্ঘ জীবনের ভ্রমণ অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করেই তিনি তার বিখ্যাত গ্রন্থ রচনায় হাত দেন- ইতোপূর্বে যা উল্লেখ করা হয়েছে। ১ম শতকের অপর একজন পর্যটক ইব্রাহীম ইবন ইয়াকুব জার্মান ও পাশ্চাত্যের ভাষাভাষী দেমসমূহ পরিভ্রমণ করেন।

ইবন যুবায়র অন্যতম অপর একজন বিখ্যাত মুসলিম পর্যটক। তিনি রচনা করেন তার ভ্রমণ সংক্রান্ত অনন্য গ্রন্থ *রিহলাতুল কিনানী*। এ জাতীয় গ্রন্থের মধ্যে আরবি সাহিত্যের এটাই শীর্ষস্থানীয়। অনেক মজার তথ্য, ভৌগলিক পর্যবেক্ষণ, এ বিষয়ের ওপর প্রয়োজনীয় অর্থপূর্ণ নোট। উদাহরণস্বরূপ জাহাজ সম্পর্কিত বিভিন্ন দিকের ওপর আলোচনা, দাতব্য চিকিৎসালয় আক্রমণস্থল এবং সেই সাথে এতে রয়েছে উত্তম রাজা দ্বিতীয় উইলিয়ামের (১১৬৬-১১৯৯) সিসিলির এক বাস্তব চিত্র।

সুবিখ্যাত ভূ-পর্যটক ইবন বতুতা মূলতই মধ্য যুগের শ্রেষ্ঠ পর্যটক, যিনি তাঁর সময়ে সিংহল, চীন এবং কনস্টান্টিনপল বাদে প্রতিটি মসলিম দেশ ভ্রমণ করেন। তিনি মালদ্বীপের দ্বীপ পরিদর্শন করে সিংহল পেরিয়ে আদমস পর্বতের শীর্ষে আরোহন করেন। অতঃপর তিনি আফ্রিকার অভ্যন্তরেও প্রবেশ করেন।

আবু জাহিদ আর একজন শ্রেষ্ঠ পর্যটক। *আখরারুসসিন ওয়াল হিন্দ* গ্রন্থের তিনি রচয়িতা। গ্রন্থটিতে স্থান পেয়েছে তার সুদীর্ঘ ভ্রমণের সঞ্চিত বহু মহা মূল্যবান তথ্য। এ কারণেই মারকো পলের (Marco Polo) পূর্বে এ জাতীয় গ্রন্থের মধ্যে এটিই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ বলে মেনে নেয়া হয়।

আল আবদারী ১৩ শতকের শ্রেষ্ঠ পর্যটক। ১২৮৯ সালে তিনি মরক্কোর পশ্চিম উপকূল থেকে পবিত্র হজ পালনের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন। এরই মধ্যে তিনি ইসলামের পবিত্র স্থানসমূহ পরিদর্শন করে গোটা উত্তর আফ্রিকা ঘুরে বেড়ান। তাঁর গ্রন্থ আর *রিবহাতুল মাগরিবিরাহয়া* নির্দিষ্ট স্থানের নিঁখুত ও প্রণালী সম্মত তথ্য এবং মুসলিম জীবন প্রবাহ ও তাঁদের আভিজাত্যের এক সঠিক ও বাস্তব চিত্র।

Source: *Arab Discovery of America* by Dr. Hasan Zaman (Translated Chapter I: Muslim Contribution to Geography), Dacca: P. P. P. P & Publishers, 1970, Pp. 1-20.